Society & Change
Vol. III, No.1, January-March 2009
ISSN 1997-1052

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার ও সাধারণ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার তুলনামূলক পর্যালোচনা

মোসাঃ শামসুন্নাহার*

Abstract

Democratization needs a uniform system of local government in a given polity, otherwise undesirable and unviable diversity impedes the process of democratization. Now, it makes way out for challenge of dysfunctionality in the relevant political process with effect of anomaly in many other respects. Such a perspective has been generated through Hill Tract Peace Pact 1997, Regional Council Act 1998, Hill Tract District Council Act 1998 in the 3 Hilltract districts of Bangladesh. These Acts in effect have created a great differences between the local government system in the country in general and the Hill Tracts region in particular. The consequence has been that there now prevails cleavage between civil and military, plainlanders and paharis, centrals and locals, Tribes and Bangalis. In the Hilltract these prevails union council like how it is in the rest of Bangladesh. In addition to that local circle chief or king and under the king there are Moujas headed by a headman and number of karbaris. These headmen and karbaris are nominated by the king and appointed by the D.C. These employees get salary from the government exchequer and at the same time get taxes from the common men.

While Union Council functions under democratic governmental system the Local Circles function under monarchy. This is a great and penetrating contrast. How monarchy and democracy can go hand in hand is a big question mark which posses a threat to the sovereignty of the state and can be a way out for foreign intervention. A remedy is urgently needed to bring national uniformity of local government system keeping the cultural uniqueness of the hill people.

ভূমিকা

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা দেশের সামগ্রিক শাসন প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কোন এলাকার বিশেষ প্রাকৃতিক ও ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য, জনসাধারনের জীবনমানের ভিন্নতা, সর্বোপরি সেবা ও সরবরাহ, চাহিদার ধরন ও প্রকৃতি ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে স্থানীয় সরকারের প্রকৃতি, ক্ষমতা ও কার্যাবলীতে ভিন্নতা দেখা যায়। কিন্তু স্থানীয় শাসন ও

* প্রভাষক, রাজনীতি ও প্রশাসন বিভাগ, গণবিশ্ববিদ্যালয়।

উন্নয়নের একটি সাধারন ও সার্বজনীন রাষ্ট্রীয় নীতি কাঠামোর মধ্যেই এ ভিন্নতাকে লালন করতে হয়। বাংলাদেশ রাষ্ট্র হিসেবে নবীন হলেও একটি সমাজ ব্যবস্থা ও দেশ হিসেবে অনেক প্রাচীন। তাই বিশ্বের অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতাভূক্ত দেশ ও সমাজের মত এখানেও গ্রাম, শহর ও বিশেষ অঞ্চলভিত্তিক স্থানীয় শাসনের রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস সমৃদ্ধ ঐতিহ্য। কখনো কখনো দেখা যায় যে, বিধিবদ্ধ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা চালু কিংবা মাঝে মাঝে এ ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের সময় ঐ সমৃদ্ধ ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং অতীত অভিজ্ঞতাকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয় না। উপরন্তু স্থানীয় সরকারকে সামগ্রিক প্রশাসন উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বৃত্ত থেকে আলাদা করে শুধু রাজনৈতিক প্রশাসনিক একক সৃষ্টির একটি ভ্রান্ত মানসিকতা এখানে প্রাধান্য পেয়ে যায়।[১] যে কোন দেশের সার্বিক উন্নয়নে শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বিশেষ ভুমিকা পালন করে থাকে। সাম্প্রতিক রাষ্ট্রীয় অবস্থা বিবেচনায়ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বহুল আলোচিত। একই দেশে দু'রকম স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিষয়টি এ আলোচনায় নতুন মাত্রাযুক্ত করেছে। এ প্রেক্ষাপটেই; এনিবন্ধে বাংলাদেশ পার্বত্যচট্টগ্রাম এলাকা এবং সাধারণ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

প্রাচীন আমল

বর্তমানে বাংলাদেশে যে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে, তা একদিনে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এর পেছনে রয়েছে সুদূর প্রসারী ইতিহাস। ক্রমবিকাশের মাধ্যমে তা বর্তমান স্তরে এসে পৌঁছেছে। প্রাচীন সমাজে ৩ ধরনের স্থানীয় সরকার বিদ্যমান ছিল। প্রথমত: স্থানীয় সরকার ছিল একমাত্র সরকার ব্যবস্থা যেখানে কোন কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের অস্তিত্ব ছিল না। দ্বিতীয়ত: আরেক ধরনের স্থানীয় সরকার যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী এবং স্থানীয় সরকারের ভূমিকা ছিল গৌণ। শেষত: কিছু স্থানীয় সরকার যা ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের কেন্দ্রে পরিণত হওয়ার জন্য সচেষ্ট ছিল।[২] উপমহাদেশে গ্রামীন স্বায়ত্বশাসিত ব্যবস্থা (Village self government) অতি প্রাচীন। খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০-১০০০ পর্যন্ত সময়ের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে লক্ষ্য করা যায় যে ঐ সময়েও গ্রাম পর্যায়ে স্থানীয় শাসনের অস্তিত্ব ছিল। গ্রামীন সংগঠনসমূহ গ্রামের শান্তি, শৃংখলা ও সামাজিক বিষয়াদি সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন করত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও বর্ণিত হয়েছে গ্রাম কাউন্সিলের গঠন ও কর্মকান্ড। এ সকল প্রধাণ ব্যক্তিগণকে সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে নেয়া হত এবং গ্রামের যাবতীয় বিষয়াদি তারাই দেখাশুনা করতেন। গুপ্ত আমলে শহর ও গ্রাম এলাকার জন্য স্থানীয় সরকার ছিল। সমগ্র সাম্রাজ্য তখন মন্ডল, বিথি এবং গ্রামে বিভক্ত ছিল। এগুলোকে বর্তমানে বিভাগ, জেলা, মহকুমা, ইউনিয়ন ও গ্রামের সাথে তুলনা করা যায়। প্রতিটি স্তরে একজন করে শাসক থাকতেন এবং তিনি নিজ এলাকার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকতেন।

বৃটিশ আমল

১৭৭৩ সালের সনদ আইনে কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই (মুম্বাই) প্রেসিডেন্সিতে স্বায়ত্ত্বশাসিত সংস্থা গঠনের কর্তৃত্বদান করা হয় গভর্নর জেনারেলের উপর। ব্রিটিশ ব্যবস্থার অনুকরনে ভারতের প্রেসিডেন্সি শহরগুলোতে স্বায়ত্ত্বশাসিত সংস্থা গড়ে ওঠে। ১৮৫৬ সালে এ ব্যবস্থার আরো উন্নতি সাধিত হয়।[৩] কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ছাড়াও ১৮৫০ সালে বেঙ্গল কাউন্সিলে একটি পৌরসভা আইন প্রণীত হয়। এ আইনের ফলে বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও ময়মনসিংহে পৌরসভা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হয়।[৪] ১৮৭০ সালে ব্রিটিশ সরকার গ্রাম্য চৌকিদারী আইন (The Bengal Village Chaukidari Act of 1870) প্রণয়ন করেন। এই আইনের মাধ্যমে ১০ থেকে ১২ বর্গমাইল ব্যাপী এলাকাকে ইউনিয়ন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।[৫] ভাইসরয় লর্ড রিপন শাসন ব্যবস্থার সংস্কারে আগ্রহী ছিলেন। তারই উদ্যোগে ১৮৮৫ সালের স্থানীয় শাসন আইনটি প্রনীত হয়।[৬] এ আইনের মাধ্যমে দ্বিবিধ পর্যায়ে গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় যেমন: মহকুমা পর্যায়ে লোকাল বোর্ড এবং জেলা পর্যায়ে জেলা বোর্ড। ১৮৮৫ সালে ১৬ টি জেলায় এবং ১৮৮৭ সালে ৩৭ টি জেলায় লোকাল বোর্ড ও জেলা বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়।[৭] বস্তুত: বর্তমানে আমরা স্থানীয় সরকারের যে সুফল ভোগ করছি তা শতবর্ষ পূর্বে লর্ড রিপন প্রথমে সুপারিশ এবং পরবর্তীতে তা প্রতিষ্ঠার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। স্থানীয় সরকার সম্পর্কে রেজুলেশন গ্রহনের সময় তিনি যথার্থই বলেছিলেন যে, "তিনি এমন এক বৃক্ষ রোপন করেছেন যা ভবিষ্যতের মানুষকে আশ্রয় ও ফলদান করবে।"[৮] ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত মহকুমা পর্যায়ে লোকাল ব্যবস্থা চালু ছিল। ১৯৩৬ সালে জেলা বোর্ডে প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা চালু হয় বোর্ডের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য নির্বাচনের জন্য। এ ব্যবস্থা ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।[৯] বিভিন্ন স্তরে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে আরো বেশী শক্তিশালী ও কার্যক্ষম করার জন্য ১৯১৯ সালে বঙ্গীয় স্বায়ত্তশাসন আইন (Bengal Village Self Government Act 1919) প্রণীত হয়। এরই ভিত্তিতে বাংলাদেশের সর্বত্র ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়।

পাকিস্তান আমল

১৯৩৬ সাল পর্যন্ত মহকুমা পর্যায়ে যে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা চালু ছিল তা ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল এবং ১৯৩২ সালের প্রণীত পৌরসভা আইন ১৯৬০ সাল পর্যন্ত বলবৎ থাকে। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারী হয়। এ সময় ১৯৫৬ সালের সংবিধান বাতিল করা হয়, আইনসভা ভেঙ্গে দেয়া হয় ও রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম বেআইনি ঘোষিত হয়। সামরিক শাসক এর ১৯৫৯ সালের অক্টোবর মাসে জারীকৃত মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ ১৯৫৯ (The Basic Democracies Order 1959) বলে স্থানীয় শাসন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর পদক্ষেপ নেয়া হয়।[১০]

মৌলিক গণতন্ত্রের অধীনে পূর্ব পাকিস্তানের স্থানীয় সরকার

মৌলিক গণতন্ত্রের অধীনে স্থানীয় সরকারের স্তর		**সংখ্যা**
গ্রাম এলাকা	ইউনিয়ন কাউন্সিল	৪০৩৬
	থানা কাউন্সিল	৩৯৩
	জেলা কাউন্সিল	১৭
	বিভাগীয় কাউন্সিল	৪
শহর এলাকা	ইউনিয়ন কমিটি	৩৭
	পৌর কমিটি	২৯

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে এ ব্যবস্থা শিথিল হয়ে আসে।

স্বাধীনতা উত্তর আমল

স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার স্থানীয় শাসন ব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করার জন্য সচেষ্ট হয়। ১৯৭২ সালের ৭ নং রাষ্ট্রপতির আদেশ মতে, প্রচলিত সকল স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা বাতিল ঘোষিত হয়।[11] আমাদের দেশে স্থানীয় সরকারের সুদীর্ঘ কালের ইতিহাস হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার ও অপব্যবহারের ইতিহাস। যখনই কোন নতুন সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে তারা তাদের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার নীল নকশা তৈরীর কাজে স্থানীয় সরকারকে ব্যবহার করেছে।[12] এরই ধারাবাহিকতায় এভাবে স্বাধীনতা পূর্ব পাকিস্তানী আমলের মৌলিক গনতন্ত্র (১৯৬০-৭০), স্বাধীনতার পর মনোনীত ইউনিয়ন পঞ্চায়েত ও ইউনিয়ন গ্রাম কমিটি,থানা উন্নয়ন কমিটি(১৯৭২-৭৫), গ্রাম সরকার ও জেলা উন্নয়ন সমন্বয়কারী (১৯৭৬-৮০), উপজেলা ব্যবস্থা ও মনোনীত সাংসদদের সভাপতিত্বে জেলা পরিষদ (১৯৮১-৯০) প্রতিষ্ঠিত হয়। আবার ১৯৯১ সাল হতে উপজেলা পরিষদ বাতিল করে স্থানীয় সরকার পুনর্গঠনের কোন উদ্যোগ গ্রহন থেকে বিরত থাকা এসবই স্থানীয় সরকার সংস্থাকে ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহারের সাক্ষ্য বহন করে।

বিভিন্ন শাসনামলে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা

বিভিন্ন শাসনামল	**স্থানীয় সরকারের স্তরসমূহ**	
	গ্রাম পর্যায়ে	**নগর পর্যায়ে**
* শেখ মুজিব শাসনামল	ইউনিয়ন পরিষদ থানা উন্নয়ন কমিটি জেলা বোর্ড	পৌরসভা
** জিয়াউর রহমান আমল	স্বনির্ভর গ্রাম সরকার ইউনিয়ন পরিষদ থানা পরিষদ জেলা পরিষদ	পৌরসভা
*** এরশাদ আমল	পল্লী পরিষদ ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলা পরিষদ জেলা পরিষদ	সিটি কর্পোরেশন পৌরসভা
**** খালেদা জিয়া আমল	ইউনিয়ন পরিষদ	সিটি কর্পোরেশন

বিভিন্ন শাসনামল	স্থানীয় সরকারের স্তরসমূহ	
	গ্রাম পর্যায়ে	নগর পর্যায়ে
	থানা উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটি	পৌরসভা
শেখ হাসিনা আমল	ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলা পরিষদ জেলা পরিষদ	সিটি কর্পোরেশন পৌরসভা

*সূত্র: * সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনীর পর মুজিব সরকার উপরিউক্ত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন জানুয়ারী ২৬, ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে।*

** Local Government Ordinance 1976, Local Government Amendment Act 1980.

*** The Local Government (Union Parishad) Ordinance 1983, The Local Government (Zila Parishads) Act 1988. The Local Government Upazila Parishad and Upazila Reorganization Act 1982. The Palli Parishad Act, 1989.

**** বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক দলের ভূমিকা- শেখ মেহাম্মদ ওমর ফারুক।

পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকারের ইতিহাস

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্ত এলাকার ২১° ১৩' থেকে ২৩° ৪৭' উত্তর অক্ষাংশে এবং ৯১° ৪৩' থেকে ৯২° ৪২' পূর্ব দ্রাঘিমাংশে পাহাড় বেষ্টিত ১৩,০৩৭ বর্গকিলোমিটার বিশাল অরণ্যভূমি জুড়ে এক বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়ে বাংলাদেশের ৩ টি পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটি, বান্দরবন এবং খাগড়াছড়ি অবস্থিত। অতীতে এ অঞ্চল পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা নামে সরাসরি বৃটিশ ভারতের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। নতুন এ জেলা ১৮৬০ সালের ২১নং আইন, ১৮৬৩ সালের ৪ নং আইন, ১৮৭৩ সালের ৩নং বিধি এবং ১৮৮১ সালের ৩নং বিধি দ্বারা শাসিত হয়। অতঃপর Chittagong Hill Tracts Regulation -1900 (১৯০০ সালের ১নং বিধি) নামক এক নতুন আইনের অধীনে ১৯০০ সাল থেকে শাসিত হয়ে আসছে। ১৯২০ সাল থেকে Excluded Area, ১৯৬২ সাল থেকে Tribal Area এবং ১৯৬৪ সালে Chittagong Hill Tracts Regulation 1900 বাতিলের মাধ্যমে কয়েকদিনের জন্য এ অঞ্চল সাধারন এলাকা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। পরবর্তীতে আবার উপজাতীয় প্রধানদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাহী আদেশে Chittagong Hill Tracts Regulation-1900 পুনর্বহালের মাধ্যমে Tribal Area নামে পুনঃপরিচিতি লাভ করে। পার্বত্য শান্তিচুক্তি ১৯৯৭, পার্বত্য শান্তিচুক্তির ফসল আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮, পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ ইত্যাদি নতুন নতুন আইনে এ ৩ টি জেলা দেশের বাকী ৬১ টি জেলা থেকে ক্রমান্বয়ে পৃথক এবং এক বৈচিত্র্যময় শাসন ব্যবস্থার অধীন একটি পৃথক অঞ্চলে রূপান্তরিত হয়েছে।[১৩]

পার্বত্য এবং অপার্বত্য অঞ্চলের বর্তমান স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার একটি চিত্র

পার্বত্য এবং অপার্বত্য বা সমতল ভূমি মিলিয়ে বাংলাদেশে বর্তমানে তিন ধরনের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে

১. গ্রামীন স্থানীয় সরকার যার আওতায় রয়েছে নির্জীব ইউনিয়ন পরিষদ, বিলুপ্ত উপজেলা পরিষদ এবং জনপ্রতিনিধিত্বহীন জেলা পরিষদ।[১৪]

২. নগরকেন্দ্রিক স্থানীয় সরকার যথাঃ পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন -পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনসমূহ কোন প্রশাসনিক স্তর না হয়েও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত।[১৫]

৩. এলাকাভিত্তিক বিশেষ স্থানীয় সরকার যেমন দেশের তিনটি পার্বত্য জেলা বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটির জন্য বিশেষ ধরনের জেলা পরিষদ এবং পার্বত্য সার্কেল প্রধান বা পার্বত্য রাজাদের অধীন হেডম্যান-কারবারী প্রথা এবং সাম্প্রতিককালে গঠিত পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ।[১৬]

একনজরে বাংলাদেশের সার্বিক স্থানীয় সরকার কাঠামো

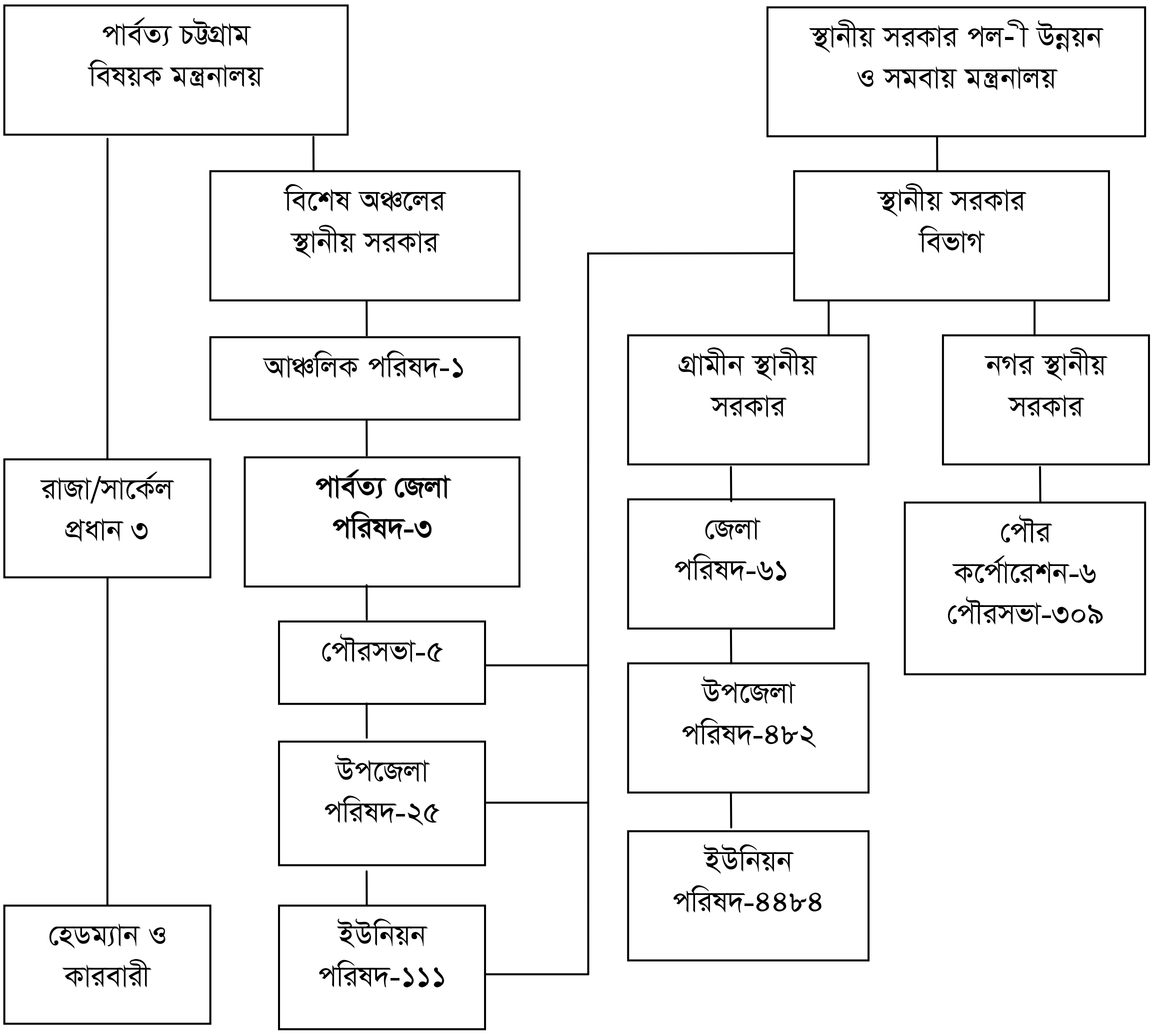

সূত্র ঃ একুশ শতকের স্থানীয় সরকার এবং মাঠ প্রশাসন: কতিপয় সংস্কার প্রস্তাব, -ড. তোফায়েল আহমেদ, পৃষ্ঠা - ১৮ ।

ব্রিটিশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন এ্যাক্ট (১৯০০) জারী করে পার্বত্য চট্টগ্রামকে দ্বৈতশাসন পদ্ধতিতে প্রশাসন ব্যবস্থার একটি বহির্ভূত এলাকা বা Excluded area এর মর্যাদা দান করে এবং রাজস্ব ও সামাজিক বিচারের ভার রাজা ও অধীনস্থ হেডম্যানদের ওপর আরোপ করে। এই এ্যাক্ট অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামকে চাকমা, বোমাং ও মং সার্কেলে বিভক্ত করা হয়।[১৭] এখানে উল্লেখ্য যে, চাকমা সার্কেল রাঙ্গামাটি জেলার জন্য যার বর্তমান রাজা দেবাশীষ রায়, বোমাং সার্কেল বান্দরবন জেলার জন্য যার বর্তমান রাজা অং শৈপ্রু মারমা এবং মং সার্কেল খাগড়াছড়ি জেলার জন্য যার বর্তমান রাজা থোই হ্লাপ্রু মারমা। তাঁরা প্রশাসনিক বিষয়ে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। প্রত্যেক মৌজার সার্বিক প্রশাসন পরিচালনার জন্য হেডম্যান নিযুক্ত করা হয় আর প্রতিটি পাড়ার দায়িত্ব দেওয়া হয় একজন কর্মচারীকে। এই রেগুলেশন অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার শাসন ব্যবস্থা ছিল অন্যান্য জেলা থেকে ভিন্ন ধরণের। জেলার সর্বময় দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন ডেপুটি কমিশনার। একাধারে তিনি ছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপার, নির্বাহী প্রকৌশলী, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিভিল সার্জন, দেওয়ানি ও রাজস্ব বিভাগের কর্মকর্তা।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ডেপুটি কমিশনারের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও দেওয়ানি (সহকারী জজ) এর ক্ষমতা ছাড়া বাকি সব ক্ষমতা প্রত্যাহার করা হয়। অবশ্য বিভিন্ন সময়ে এ অবস্থার পরিবর্তন করা হয়। পাকিস্তান শাসনামলে ১৯৫৬ ও ১৯৬২ সালের সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামকে 'বহির্ভূত এলাকা' হিসেবে গণ্য করা হলেও ১৯৬৩ সালে সংবিধানের এক সংশোধনীর মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিশেষ মর্যাদা রহিত করা হয়। পাকিস্তান সরকার ১৯৪৮ সালে Chittagong Hill Tracts Frontier Police Regulation Act. 1881 অনুসারে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করলে, পার্বত্য চট্টগ্রামের লোকদের মধ্যে এক ধরণের ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। জেনারেল জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে অর্থনৈতিক সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করে, ১৯৭৬ সালে ২০শে অক্টোবর এক অধ্যাদেশের (৭৭নং অধ্যাদেশ) মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড' প্রতিষ্ঠা করেন।[১৮]

বাংলাদেশে জেনারেল এরশাদ প্রথম বারের মত জনপ্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে ১৯৮৯ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থানীয় সরকার নামে "সীমিত স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থা" প্রবর্তন করেন।[১৯] এরশাদ সরকার পার্বত্য উপজাতির ৯ দফা দাবিকে আইনগত ভিত্তি প্রদানের নিমিত্তে ১৯৮৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী তারিখে জাতীয় সংসদে ৩টি বিল উত্থাপন করেন। এই বিলসমূহ ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯ আইনে পরিণত হয়।[২০] এই আইনগুলো হল

১. খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯

২. বান্দরবন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯

৩. পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯

বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণের পর বিতর্কিত স্থানীয় সরকার পরিষদ বাতিলের পরিবর্তে একে শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন এবং ১৯৯১ সালের ২০ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে প্রধান করে ৮ সদস্য বিশিষ্ট 'পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক' মন্ত্রী পরিষদ কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। শান্তি চুক্তির মাধ্যমে ১৯৮৯ সালের ১৯, ২০ ও ২১ নং আইন সংশোধন করে তিন পার্বত্য জেলা সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হয়। এই পরিষদের থাকবে একজন চেয়ারম্যান। তিনি পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হবেন। তিনি প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা ভোগ করবেন। চেয়ারম্যান অবশ্যই একজন উপজাতীয় হবেন। এই পরিষদের সদস্য সংখ্যা থাকবে ২২ জন। পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উপজাতীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন।

তিনটি পার্বত্য জেলা বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটির ক্ষেত্রে সামগ্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থায় একদিকে যেমন বিরাজ করছে সামরিক-বেসামরিক, পাহাড়ী-সমতলভূমি কেন্দ্রীয়-স্থানীয় এবং বাঙালী-উপজাতি বিষয়ক দ্বন্দ্ব তার সাথে সবার অলক্ষ্যে স্থানীয় সরকার কাঠামোয় বিরাজ করছে একটি অব্যবস্থা। পার্বত্য অঞ্চলের বিশেষ ধরনের জেলা পরিষদসমূহ রাজনৈতিকভাবে একটি প্রদর্শনীর বিষয় হলেও প্রশাসনিক ও উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনায় এগুলো বিশেষ অবদান রাখতে পারেনি। পার্বত্য অঞ্চলে জেলা প্রশাসন ও জেলা পরিষদের সম্পর্ক বরাবরই ছিল তিক্ততাপূর্ণ। দু'কাঠামোর দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত জেলা প্রশাসনের আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর শ্রেষ্ঠত্বই বজায় থেকেছে। তাছাড়া ঐ তিন অঞ্চলের নগরাঞ্চলে পৌরসভাসমূহও কাজ করছে এবং সেখানে নিয়মিত নির্বাচনও হচ্ছে। সম্প্রতি সম্পাদিত শান্তি চুক্তির আওতায় গঠিত আঞ্চলিক পরিষদের উপস্থিতিতে বিষয়টি সহজ না হয়ে আরও জটিল আকার ধারন করেছে।

একইরকমভাবে তিনটি পার্বত্য জেলার গ্রামাঞ্চলেও বিরাজ করছে এক ধরনের দ্বৈত ব্যবস্থা। একদিকে রয়েছে সমতলভূমির মত একই আইনে পরিচালিত ইউনিয়ন পরিষদ, অপরদিকে স্থানীয় সার্কেল প্রধান বা রাজার অধীনে প্রতি রাজস্ব মৌজার জন্য রয়েছে হেডম্যান ও কারবারী। যারা স্থানীয় রাজা কর্তৃক মনোনীত এবং জেলা প্রশাসক কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত। এই হেডম্যান ও কারবারীগণ সরকারী কোষাগারের ভাতা ছাড়াও ভুমি রাজস্বের একটা অংশ ভোগ করে থাকেন অর্থাৎ হেডম্যান ও কারবারী প্রথার সমান্তরাল বা মুখোমুখি একটি সংগঠন হলো ইউনিয়ন পরিষদ। জেলা পরিষদের ক্ষেত্রেও রয়েছে নানাবিধ জটিলতা তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো নিয়োগ এবং কর্মকান্ড সংক্রান্ত। পার্বত্য ৩ টি জেলার জেলা পরিষদের মধ্যে রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদে থাকবে ১ জন চেয়ারম্যান, ২০ জন উপজাতীয় সদস্য এবং ১০ জন অ-উপজাতীয় সদস্য। খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদে থাকবে ১ জন চেয়ারম্যান, ২১ জন উপজাতীয় সদস্য এবং ৯ জন অ-উপজাতীয় সদস্য। বান্দরবন জেলা পরিষদে থাকবে ১ জন চেয়ারম্যান, ১৯ জন উপজাতীয় সদস্য এবং ১১ জন অ-উপজাতীয় সদস্য। বাকী

৬১টি জেলায় ও ১ জন চেয়ারম্যান এবং নির্ধারিত সংখ্যক সদস্য থাকার কথা থাকলেও বর্তমানে শুধু ১ জন সরকার কর্তৃক নিয়োপ্রাপ্ত প্রধাণ নির্বাহী কর্মকর্তা রয়েছেন যিনি উপসচিব পদমর্যাদার। পার্বত্য ৩ টি জেলার জেলা পরিষদের কার্যাবলী বাকী ৬১টি জেলা থেকে কিছুটা হলেও ভিন্ন কারণ সরকারের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টকে (যেমন - সমবায়, মৎস্য,সমাজকল্যাণ ইত্যাদি) ডেপুটেশন দেয়া আছে পার্বত্য ৩টি জেলার জেলা পরিষদে। এখানে উল্লেখ্য যে, ২৯ ডিসেম্বর ২০০৭ ঢাকার সিরডাপ মিলনায়তনে শক্তিশালী স্থানীয় সরকার জাতীয় কনভেনশন আয়োজক কমিটির ২৭ টি সংগঠনের আয়োজনে "স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরন কমিটির সুপারিশ, পর্যালোচনা ও করনীয়" শীর্ষক এক গোল টেবিল বৈঠক আলোচনায় সম্পূরক সুপারিশ হিসেবে পার্বত্য জেলা পরিষদ গুলোর নিকট হস্তান্তরিত সরকারী বিভাগ গুলির আর্থিকসহ সব ধরনের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রদান করা এবং বিদ্যমান তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে যথাসময়ে নির্বাচনের কথা বলা হয়। (সূএঃ প্রথম আলো, ৪ জানুযারী,২০০৮) স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় শাসনের জগতে পার্বত্য অঞ্চলে এমনিতেই একটি অব্যবস্থা ও নৈরাজ্য চলছে বর্তমান সময়ে তাড়াহুড়া করে স্থানীয় সরকারের স্তর সংখ্যা হ্রাস বা বৃদ্ধি এই সমস্যাকে আরো জটিল করে তুলবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার আইনগত ভিত্তি

স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার স্থানীয় শাসন ব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করার জন্য ১৯৭২ সালের ৭ নং রাষ্ট্রপতির আদেশ মতে, প্রচলিত সকল স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা বাতিল ঘোষনা করে। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে নিম্নোক্ত আইনগুলোর ভিত্তিতে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সংগঠিত করা হয় ঃ

০১। রাষ্ট্রপতির আদেশ নং - ৭, ১৯৭২।

০২। রাষ্ট্রপতির আদেশ নং -২২, ১৯৭৩।

০৩। স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ, ১৯৭৬।

০৪। পৌরসভা অধ্যাদেশ, ১৯৭৭।

০৫। স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ এবং উপজেলা প্রশাসন পুনর্গঠন) অধ্যাদেশ, ১৯৮২।

০৬। স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩।

০৭। চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অধ্যাদেশ, ১৯৮২।

০৮। স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ এবং উপজেলা প্রশাসন পুনর্গঠন) (২য় সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩।

০৯। স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩

১০ স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ এবং উপজেলা প্রশাসন পুনর্গঠন) (৩য় সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩।

১১। স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ এবং উপজেলা প্রশাসন পুনর্গঠন) (৪র্থ সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৮৪।

১২। ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অধ্যাদেশ, ১৯৮৩।

১৩। খুলনা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অধ্যাদেশ, ১৯৮৪।

১৪। রাজশাহী মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এ্যাক্ট, ১৯৮৭।

১৫। স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) এ্যাক্ট, ১৯৮৮।

১৬। স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ এবং উপজেলা প্রশাসন পুনর্গঠন) (৩য় সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৯১।

১৭। গ্রাম পরিষদ আইন, ১৯৯৭।

১৮। উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮।

১৯। জেলা পরিষদ আইন, ২০০০।

২০। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯।

২১। বান্দরবন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯।

২২। পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯।

পাবর্ত্য চট্টগ্রামের সমস্যার ঐতিহাসিক পটভূমি

পাবর্ত্য চট্টগ্রামের জিইয়ে চলা ঘটনাবলী নতুন কোন ইতিহাস নয়। অনুমান করা হয় উপমহাদেশ বিভক্তির পূর্ব থেকেই একটু একটু করে চলে আসা এক গোলাবারুদ দ্বন্দ্ব। বস্তত: পাবর্ত্য চট্টগ্রামের বহুবিধ সমস্যার মূল কারণ রাজনৈতিক এটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। এর সাথে বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক কারনও সংশ্লিষ্ট। নিম্নে আলেচনার সুবিধার্থে তা উল্লেখ করা হল -

বৃটিশ আমল

বৃটিশ আমলে ১৮৬০ সনে পাবর্ত্য চট্টগ্রামকে জেলায় রূপান্তরিত করা হয়। বৃটিশদের আইনে পাবর্ত্য চট্টগ্রাম ছিল এক বহির্ভূত এলাকা যা “পাবর্ত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন ১৯০০” তে উল্লেখ করা হয়। এ আইনে তৎকালীন ভারতের অন্যান্য এলাকার প্রশাসনিক ও সম্পত্তি বিষয়ক আইন পাবর্ত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না এবং অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের বসতি স্থাপনও নিষিদ্ধ ছিল। এ অঞ্চল ছিল বৃটিশদের প্রবর্তিত “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ” আইনের বাইরে।[২২]

পাকিস্তান আমল

১৯৪৭ সনে ভারত বিভক্ত হলে পাবর্ত্য এলাকার অধিবাসীবৃন্দকে পূর্ব পাকিস্তানের সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হয় বটে, কিন্তু অধিকাংশ লোক অমুসলিম হওয়ায় পাকিস্তানের আদর্শের সাথে তারা ঐকমত্য পোষনে অসম্মতি প্রকাশ করেন।[২৩] পরে ১৯৬২ সনে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন কালে বাধের উত্তর-পূর্ব দিকে সৃষ্টি করা হয় একটি বিশাল কৃত্রিম হ্রদ। পাবর্ত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী জনগোষ্ঠী এই হ্রদকে বর্ননা করেন

"চোখের পানি দিয়ে গড়া হ্রদ" হিসেবে।[২৪] মোট চাষযোগ্য ভূমির ৫৪,০০০ একর জমি এই কৃত্রিম হ্রদের নীচে হারিয়ে যায়, পাবর্ত্য জনগোষ্ঠীর বসবাসকৃত ১২৫টি মৌজা তলিয়ে যায়, বাস্তুহারা হয় প্রায় ১ লাখ মানুষ। বাস্তুহারা মানুষের পুনর্বাসন এবং ক্ষতিপূরনের জন্য সরকারী হিসাব অনুযায়ী ৫৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদান করা হয় কিন্তু বাস্তবে মাত্র ২.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিতরন করা হয়। ফলে অত্র অঞ্চলের বিপুল জনগোষ্ঠী অর্থনৈতিকভাবে চরম ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

২৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৬ সালে গৃহীত পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রেও পাবর্ত্য চট্টগ্রামকে একটি "পৃথক শাসিত অঞ্চল" রূপে ঘোষনা করা হয়। এরপর ১৯৬২ সনে পাকিস্তানের ২য় শাসনতন্ত্রে ১৯৩৫ সনের শাসনতন্ত্রের "পৃথক শাসিত অঞ্চল" শব্দের পরিবর্তে "উপজাতীয় অঞ্চল" শব্দ ব্যবহার করা হয়।

বাংলাদেশ আমল

১৯৭৩ সনের শেষের দিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান রাঙ্গামাটিতে এক জনসভায় ঘোষনা করেন "উপজাতি নয় আমরা সবাই বাঙ্গালী।" শেখ মুজিবর রহমানের এ ঘোষণায় উপজাতীয়রা মোটেই খুশি হতে পারেনি। এর বিরুদ্ধে জোরালো বক্তব্য রাখেন চাকমা নেতা মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা। তিনি বলেন "বাংলাদেশে বসবাসকারী সবাই বাংলাদেশী এবং উপজাতীয়রা সংগত কারনেই বাঙ্গালী নয়। তাহলে উপজাতীয়দের জাতিসত্ত্বার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়, যা পৃথিবীর কোথাও করা হয়নি।" ১৯৭২ সনে বাংলাদেশের গণপরিষদে যখন বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হচ্ছিল, তখন জাতিগত পরিচয় বাঙ্গালিত্ব গ্রহণের সময় তিনি সক্রিয় বিতর্কে অংশগ্রহণ করে যা বলেছিলেন তা খুবই উল্লেখযোগ্য। ১৯৭২ সনের ৩১ অক্টোবর গণপরিষদে তিনি বলেছিলেন "আমি একজন চাকমা। আমি বাঙ্গালী নই। আমি বাংলাদেশের নাগরিক। একজন বাংলাদেশী।" পরবর্তীতে তৎকালীন সংসদ সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের একটি দল নিয়ে গণভবনে শেখ মুজিবর রহমানের সাথে সাক্ষাত করেন। উক্ত সাক্ষাতের সময় উপজাতি প্রতিনিধি দলটি স্বায়ত্বশাসনের দাবীসহ ৪ দফা দাবি পেশ করেন। দাবিগুলি ছিল –

১। পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল হবে এবং এর একটি নিজস্ব আইন পরিষদ থাকবে।

২। উপজাতীয় জনগনের অধিকার সংরক্ষনের জন্য ১৯০০ সালে "পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির" অনুরূপ সংবিধি ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে থাকবে।

৩। উপজাতীয়দের রাজাদের দফতর সংরক্ষণ করতে হবে।

৪। সংবিধানের ১৯০০ সালের রেগুলেশন সংশোধন নিরোধ সংক্রান্ত বিধি রাখা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙ্গালী অনুপ্রবেশ বন্ধ রাখা।

কিন্তু শেখ মুজিব উপজাতীদের এসকল দাবি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। এরপর হতাশ হয়ে ফিরে গিয়ে মিঃ মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা মনে প্রাণে শান্তিবাহীনি গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। (সূত্রঃ বাংলাদেশের উপজাতিদের আইন-রামকান্ত সিংহ, পৃঃ ২২৬। লোক প্রশাসন তত্ত্ব ও বাংলাদেশ প্রশাসন, ডঃ মোহাম্মদ শামসুর রহমান পৃঃ ৭৪৭)। ১৯৭৫ পরবর্তীকালে এ অঞ্চলে ব্যাপকহারে অনুপ্রবেশ শুরু হয় এবং ক্যান্টনমেন্ট তৈরী ও এর পরিধি বিস্তার করা হয় ফলে ব্যাপকহারে সৈন্য সমাবেশ ঘটে। এসব কারনে উপজাতীয়রা নিজেদেরকে চরম উপেক্ষিত মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করতে শুরু করে।

বিশ্লেষণ

স্থানীয় সরকার পদ্ধতির অর্থ কোন ভাবেই স্থানীয়, আঞ্চলিক অথবা গোষ্ঠী সংস্কৃতির মূল্যবোধগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া নয় বরং জীবনাচরন, জীবনবোধ এবং ভাবনার আঙ্গিকে সব রকমের বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে নিয়েই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় একাত্ম হওয়াই এর উদ্দেশ্য। স্থানীয় সরকারের অর্থই হচ্ছে তাৎপর্যপূর্ণ বিকেন্দ্রীকরণ। অন্যকথায় বলা যায় যে, স্থানীয় মানুষ ও সংস্কৃতিকে স্বীকার করে স্থানীয় উদ্যোগ ও উদ্দীপনাকে জাতীয় উদ্যোগ ও উদ্দীপনার সঙ্গে সমন্বিত করা। কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় এই দুই মাত্রা একত্রে একটি শক্তিশালী ধারা হিসেবে গড়ে উঠবার পূর্বশর্ত হলো স্থানীয় স্তরের স্থানীয় মানুষের চেতনা ও উপলব্ধির সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। পার্বত্য চট্টগ্রামের সঙ্গে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের স্থানীয় সরকারের ধরন ও প্রকৃতির মধ্যে একটি আমূল বৈপরীত্য রয়েছে। আর এই বৈপরিত্যকে মাথায় রেখে গনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পূর্বশর্তগুলোকে প্রতিষ্ঠা দেবার আবশ্যকতা রয়েছে। লক্ষ্য করা যায় যে, গণতন্ত্রের সঙ্গে রাজতন্ত্রের একটি মৌলিক দ্বন্দ্ব রয়েছে। রাজতন্ত্র প্রতিনিধিত্ব করে সামন্তবাদের আর গণতন্ত্র প্রত্যক্ষভাবে এর বিরোধিতা করে। একই দেশে রাজতন্ত্র ও গনতন্ত্র সমান গুরুত্ব নিয়ে চলমান থাকতে পারেনা। এখানে গ্রেট বৃটেনের উদাহরণ আসতে পারে তবে সেখানে অনেক আন্দোলন সংগ্রাম, বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা ও ইতিহাস সৃষ্টির মধ্য দিয়ে গ্রেট ব্রিটেন রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের একটি সূক্ষ্ম সাবলীল পরিচালনাযোগ্য সন্ধি ঘটিয়েছে গণতন্ত্রের পক্ষে। কিন্তু এটি একটি স্বতন্ত্র ইতিহাস এবং এটি ব্রিটেনের সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় বহুকাল ধরে গড়ে উঠেছে। কিন্তু যখন একটি দেশে একক কোন রাজতন্ত্র নেই তখন এই ধরনের সমন্বয় সাধন করা বৈজ্ঞানিকভাবে বা প্রায়োগিকভাবে বা রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে করার উদাহরণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

রাজতন্ত্রের অক্ষমতায়নের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে গণতন্ত্রায়নের স্বার্থে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রশ্নগুলি এইভাবে এসেছে যে, যেসকল সামন্তবাদী সাংস্কৃতিক উপাদান গণতন্ত্রের পথে বাধা হয় সেগুলোকে পাশ কাটিয়ে জাতীয় গণতন্ত্রায়ন সম্ভব নয়। ব্যক্তির গনতান্ত্রিক আত্ম-উদ্বোধনের ক্ষেত্রটি তৈরী করা এবং সেটি তৈরী করবার জন্য যে যে প্রাসঙ্গিক গণতান্ত্রিক হাতিয়ার ব্যবহারযোগ্য সেগুলোকে সমন্বিত ভাবে সম্মিলিত করার প্রয়োজন আছে। বাংলাদেশে রাজতন্ত্রের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে চিন্তার অবকাশ আছে তা নাহলে বহি:শক্তি ঐ আঞ্চলিক রাজতন্ত্রকে ব্যবহার করে দেশকে বিচ্ছিন্নতার দিকে ঠেলে দিতে পারে। যার চূড়ান্ত ফলশ্রুতি গৃহযুদ্ধের আঙ্গিক

গ্রহন করতে পারে। একটি গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠার জন্যে একটি আঞ্চলিক সমাজকে আরও মানবায়িত ও আলোকায়িত করা প্রয়োজন যেটি সামন্তবাদের অবরুদ্ধতা থেকে ঐ সমাজকে মুক্ত করবে গণতন্ত্রের পক্ষে। আঞ্চলিক সংস্কৃতির অরাজনৈতিক উপাদানের সবকিছুকে নিরাপদে রেখেই এটি করা সম্ভব। সংখ্যালঘু হিসেবে বিবেচনাকে সম্প্রসারিত করতে গেলে নানা ধরনের জাতীয় সংখ্যালঘু প্রসঙ্গ সামনে আসবে। আমাদের এমন একটি তাত্ত্বিক কাঠামোয় উপস্থিত হতে হবে যেখানে গণতন্ত্রায়ন সংস্কৃতিকে বিপন্ন করে না এবং সংখ্যালঘু সংস্কৃতি জাতীয় সংস্কৃতিকে বিঘ্নিত করে না। একমাত্রিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বাস্তবায়নে এটি আমাদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে রাজনৈতিক অবরুদ্ধতার মাত্রাগুলোর পুনরুৎপাদনের একেবারে অবধারিত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের সরকার গুলো পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় সরকারের ধরনটিকে ধরে রাখতে চাইছে কেন? এ প্রসঙ্গে কোন সুনির্দিষ্ট ভাষ্য কোন সরকারের কাছ থেকেই পাওয়া যায়নি। শুধু ভাসমানভাবে উপজাতীয়দের অধিকারের কথাটি এসেছে এবং তাদের সংস্কৃতির নিরাপত্তার কথাটি এসেছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মানবাধিকারের যে শ্লোগান অথবা ইউএন চার্টারের অধীনে মানবাধিকার নীতি তার আলোকেই একটি স্থুল কাঠামোয় ভাবনাকে সীমিত রাখা হয়েছে। সম্ভবত পরীক্ষা করে দেখা হয়নি যে, বড়মাপের তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে উচ্চারিত গণঅধিকারের বক্তব্যগুলো সব প্রেক্ষিতে একইভাবে প্রযোজ্য কিনা এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যাপক তাত্ত্বিক কাঠামোর অনুকনা গুলোকে সমন্বিত করার জন্যে নতুন এবং উদ্ভাবনীধর্মী অবস্থান গ্রহণ করবার প্রয়োজন আছে কিনা সেটিও বিবেচনা করা হয়নি। আরেকদিক থেকে দেখলে এও প্রতীয়মান হতে পারে যে, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সম্পর্ক কাঠামোয় একটি অর্থনৈতিকভাবে দূর্বল দেশে বাংলাদেশের পক্ষে একাকী কোন স্পর্শকাতর সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব নয়। রাষ্ট্রের স্বাধীনতা, নিরাপত্তা, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক উত্তরনের জন্য আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোর সঙ্গে সম্পর্কের একটি ভারসাম্য নিশ্চিত করার প্রায়োগিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে একটি বড় মাপের তাত্ত্বিক কাঠামো, ইউএন চার্টার এবং আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণের বিষয়টিকে মনে রাখতে হয়েছে বাংলাদেশ সরকারকে। এ থেকেই একটি আত্মপ্রবঞ্চনাময় পরিপ্রেক্ষিত তৈরী হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামে যার সমাধান যুগপৎ নেতৃত্বের দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞার পূর্ব শর্তের দাবী রাখে। আমরা যতটুকু জানি বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সরকারের ভিতরে বাইরে ঐ প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা ধারন করে না সেকারনেই পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় সরকারের প্রকৃতি একটি নেতিবাচক চ্যালেঞ্জ হয়েই বিরাজ করছে। এতে শুধু যে জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরী হচ্ছে তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় তথা আপামর মানুষের স্বার্থ ও বিকাশ বিঘ্নিত হচ্ছে। গণতন্ত্রায়নের পূর্বোল্লিখিত শর্তগুলো পূরণ করতে পারলে এবং একই সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক সংস্কৃতির অরাজনৈতিক অংশটুকুকে নিরাপদ রাখতে পারলেই এই সমস্যার সমাধান মোটেই দুরূহ নয়। এতে বরং পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের যথার্থ মানবাধিকার চিহ্নিত ও মূল্যায়িত হবে।

পার্বত্য অঞ্চলে রাজতন্ত্রের মূল উপাদানগুলির উপস্থিতি আছে যা কি না বাংলাদেশে গণতন্ত্রের পথে বাধা হতে পারে, জাতীয় সংহতির বিপরীতেও তা সক্রিয়। জাতীয় সংহতির সাথে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার একটি নিবিড় সম্পর্ক আছে। এর পটভূমিতে কাজকরে ব্যক্তি তথা সমাজের আত্মবোধ। কিন্তু সামন্ত অধ্যুষিত স্থানীয় সরকারে যেহেতু এই উপাদানটি অনুপস্থিত থাকে সেহেতু তা একদিকে যেমন গণতন্ত্রকে প্রতিহত করে অন্যদিকে তেমনি জাতীয় সংহতিকেও অরক্ষিত করে তোলে। আজকের মূল চ্যালেঞ্জ তাই দেশের সর্বত্র একই ধরণের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রচলন নিশ্চিত করা, এর জন্যে সরকারের বৈপ-বিক জননীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। এতে ঐ এলাকার মানুষ আত্ম আবিস্কারের পথ পাবে, তাদের বিশ্লেষণ ক্ষমতা বাড়বে এবং বিবেচনার বোধ শানিত হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামকে যদি বাংলাদেশের একটি গণতান্ত্রিক অংশ হিসেবে ধরে রাখতে হয় তাহলে এখানে রাজতন্ত্রকে অনুৎসাহিত করে বাংলাদেশের সর্বত্রব্যাপী একই ধরনের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা পদ্ধতির ব্যবস্থা করতে হবে। এতে করে পার্বত্য এবং অপার্বত্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে চেতনার ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য থাকবে না এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ সত্যিকারের মুক্তির স্বাদ পাবে। অন্যথায় গোষ্ঠীবাদ এবং বিদেশী শক্তির প্রভাবে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড এই অঞ্চলকে অস্থির করে রাখবে। পার্বত্য অঞ্চলে রাজতন্ত্রের নামে মানুষ পূজা, আত্ম অস্বীকার করার মতো ব্যক্তিকে রাজার পদতলে সপে দেয়া; এইরূপ অরাজনৈতিক আবেগপ্রবন পদ্ধতির শুধু অক্ষমতায়নই নয় বরং এটা নির্মুল করা প্রয়োজন।

নেপালে যেমন বৈদেশিক শক্তির উদ্দেশ্যমূলক ষড়যন্ত্রের কারণে সংহতি নষ্ট হচ্ছে তেমনি হচ্ছে তিব্বতের ক্ষেত্রে। রাজতন্ত্রের অক্ষমতায়ন ছাড়া গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটে না। স্থানীয় সরকারের গণতন্ত্রায়নের ক্ষেত্রে এটি আরো নিবিড়ভাবে সত্য। তবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজতন্ত্রের অক্ষমতায়ন একটি বিশেষ মাত্রা হিসেবে বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন। উদাহরনস্বরূপ ভূটানের কথা বলা যেতে পারে। পৃথিবীতে ভূটানের মত একটি ছোট্ট রাজ্যে ইতিহাসের একজন মহৎ রাজা স্বেচ্ছায় রাজতন্ত্রকে অক্ষমতায়িত করেছেন। এ হচ্ছে সামগ্রিক রাজ্যপটের বিষয়। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে সেই একই ধারার প্রবর্তন অত্যন্ত দূরদর্শিতার সঙ্গে সখ্যতার সঙ্গে ও সহনশীলতার সঙ্গে করণীয়। এখানে পাহাড়ীরা একটি জাতি সত্ত্বাকে নিজেদের মধ্যে চিহ্নিত করেছে যা শান্তি বাহিনীর পতাকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ জাতিসত্ত্বার মধ্যে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ধিকি ধিকি আগুন এখনও জ্বলমান যদিও শান্তি বাহিনী প্রায়োগিক অর্থে এখন অকার্যকর। একটি রাষ্ট্রকে যথার্থ অর্থে গণতন্ত্রায়িত করতে হলে তার স্থানীয় সরকারের প্রকৃতি সমানভাবে সর্বাঞ্চলিক হওয়া প্রয়োজন। ভিন্নতার নামে রাজতন্ত্রের ঐতিহ্যের জাতিসত্ত্বার ভাষার নামে গণপ্রতিনিধিত্বকে যদি কৌটায় কুক্ষিগত করা হয় তাহলে তার ফল শেষাবধি জাতীয় সংকটের গভীরতাকে স্পর্শ করে। যেমন চীনে করা হচ্ছে তিব্বতকে নিয়ে, ভারতকে করা হচ্ছে মিজোরামকে নিয়ে এবং রাশিয়ায় চেচনিয়াকে নিয়ে। জাতি রাষ্ট্রের সামগ্রিকতা কার্যকারিতা এবং যথার্থ স্বাধীনতার জন্যে স্থানীয় সরকার পদ্ধতি একই হওয়া বাঞ্চনীয়।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ স্থানীয় সরকারের স্তর সম্পর্কে এখনও কোন মতৈক্যে পৌঁছাতে পারেননি। স্থানীয় সরকারের স্তর বাংলাদেশে ব্যক্তি বা দলীয়

শাসনামলে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়েছে। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন পর্যায়ে স্থানীয় সরকারের কর্মপরিধি বাড়তে পারে, স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পর্কে রদবদল হতে পারে, কোন কোন ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ বাড়তে পারে আবার শিথিলও হতে পারে, কিন্তু কাঠামোর ক্ষেত্রে সকল শাসকগোষ্ঠীর একমত হওয়া প্রয়োজন। তা না হলে স্থানীয় সরকার শুধু পরিবর্তিত রূপের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকবে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোন থেকে আমরা দুটি পর্যায়ে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের কাঠামো লক্ষ্য করে আসছি - ইউনিয়ন ও জেলা। কিন্তু বাংলাদেশ সৃষ্টি হওয়ার পর থেকেই জেলা পরিষদকে কেবলমাত্র একটি কাগুজে প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে।[২৬] জেলা পরিষদের বাস্তব অবস্থায় এখনও অনিশ্চিতের মধ্যে বাঁধা পড়ে আছে। কেউ কেউ সংবিধানের ৫৯ নং অনুচ্ছেদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন গ্রাম স্থানীয় সরকারের একটি 'একক' হতে পারে না যেহেতু এটি প্রশাসনিক একক নয়। বাংলাদেশ সংবিধানের ৫৯নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে যে, 'স্থানীয় সরকার কেবলমাত্র প্রশাসনিক এককে জনগণের প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত হতে পারে'। 'গ্রাম সরকার' গঠন সাংবিধানিক বাধা হতে পারে না।[২৭] এজন্য যে, বাংলাদেশ একটি সংসদীয় সরকার এবং সংসদ এটিকে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে একটি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের এককে পরিণত করতে পারে। স্থানীয় সরকার সম্পর্কে আইন প্রণয়নকালে এই বিষয়টি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে, কেবলমাত্র সরকারি দলের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে কোন আইন রচিত না করে বিরোধী দলের মতামতসহ আইন প্রণয়ন করা বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় বিরোধী দল ক্ষমতায় এলে এরূপ প্রতিষ্ঠানকে রদবদল করার জন্য তৎপর হয়ে উঠবে। বাংলাদেশে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ঐকমত্যের ভিত্তিতে একটি স্থানীয় সরকারের কাঠামো নির্ধারণ করা একান্ত প্রয়োজন।

সমালোচনা ও সুপারিশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের একাধিক অনুচ্ছেদে সমাজের অনগ্রসর অংশের জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারনের বিধান রাখা হয়েছে। তারই সূত্র ধরে জাতীয় সংসদসহ বিভিন্ন জনপ্রতিনিধিত্বশীল স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে। সপ্তম জাতীয় সংসদের সরকার দলীয় মাননীয় চীফ হুইপ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে সম্পাদিত শান্তি চুক্তির আওতায় পার্বত্য জেলা বান্দরবন, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ির জন্য জেলা পরিষদ এবং আঞ্চলিক পরিষদের প্রতিনিধিত্বের ফর্মুলাটি দেশের অন্যান্য অংশের বসবাসরত উপজাতি, আদিবাসি সম্প্রদায়, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ঐ তিনটি জেলায় সমতল ভূমির বাঙালী জাতিগোষ্ঠীর হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ছাড়াও ছোট বড় মোট ১৩ টি উপজাতি রয়েছে। প্রস্তাবিত জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদে পার্বত্য এলাকায় বসবাসরত বাঙ্গালীসহ ১৩টি উপজাতিকে আনুপাতিক হারে প্রতিনিধিত্ব দানের কথা বলা হয়েছে। যদিও আসন বন্টন পুরোপুরি জনসংখ্যা অনুপাতে হয়নি। আশা করা যায় সরকার ও বিরোধীদল এই চুক্তির বিভিন্ন ধারা উপধারা বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়ায়

সমাধান করলে তা সুফল বয়ে আনবে। শান্তি চুক্তির বাস্তবায়ন বা পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদকে নিয়ে শুধুমাত্র পার্বত্য তিন জেলাকে কেন্দ্র করে নয় বরং সকল স্থানীয় সরকার পরিষদ এবং সারা দেশে বসবাসরত সকল সংখ্যালঘু জাতি-গোষ্ঠী আদিবাসি ও উপজাতীয় জনসমষ্টিকে নিয়ে বিষয়টি গভীরভাবে উপলব্ধি করেই স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার ভীত রচনা করতে হবে।

দেখা যায় পার্বত্য জেলাগুলোর অধীনে ভবিষ্যতে যে গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা পরিষদ সৃষ্টি করা হবে তাতে বাঙ্গালী জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বের বিশেষ কোন ব্যবস্থা না করলে তারা সে সব পরিষদসমূহে আসতে পারবে না। একই ভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে দেশের অন্যান্য অংশে বসবাসরত গারো, খাসিয়া, হাজং, সাওতাল, টিপরা, মনিপুরী, বিষ্ণুপ্রিয়া ছোটবড় আরো প্রায় ১৫টি উপজাতি বা আদিবাসী জনগোষ্ঠী রয়েছে। যারা বর্তমান ব্যবস্থাধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে উপজেলা, জেলা ও ইউনিয়নসমূহে তাদের প্রতিনিধীত্ব নিশ্চিত করতে পারবে না। মহিলাদের জন্য যে ধরনের ব্যবস্থা করা হয়েছে একই ধরনের একটি ব্যবস্থা উপজাতি বা আদিবাসী অধ্যুষিত উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামসমূহেও করা হলে একদিকে অনগ্রসর জাতি গোষ্ঠীসমূহ তাদের অভাব অভিযোগসমূহ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাধানের সুযোগ পাবে। অন্যদিকে, বৃহত্তর বাংলাদেশী সমাজের সাথে তারা নিজেদের একাত্মকরণের মাধ্যমে শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গড়তে সাহায্য করবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বা ডিভিশনের তত্ত্বাবধানে পৃথক উপজাতীয় কাউন্সিল থাকার দরুন তা, মূল স্রোতধারা হতে বিচ্ছিন্ন রয়েছে। স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বা বিশেষ মন্ত্রণালয় উপজাতীয় এবং আদিবাসী অনগ্রসর জনসমষ্টির জন্যে পৃথক কর্মসূচী গ্রহন করতে পারেন সে বিষয়ে কারো কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থাধীনে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে কার্যরত গ্রামীন স্থানীয় সরকার পরিষদ যথা জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে আদিবাসী ও উপজাতীয়দের প্রতিনিধীত্বের একটি ফর্মুলা বের করা দরকার। বিষয়টি মানবাধিকার ও সংখ্যালঘুদের প্রতি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর উদারতার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে দেশের ভাবমূর্তিকে যেমন উজ্জ্বল করবে তেমনি সাংবিধানিক অঙ্গীকার পূরণেও সহায়তা করবে।

ইউনিয়ন পরিষদ, মৌজা ভিত্তিক হেডম্যান-কারবারী, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, সার্কেল প্রধান প্রভৃতি পরস্পর বিরোধী অবস্থান গ্রহনকারী সংস্থা ও সংগঠনগুলোর মধ্যে কার্যপরিধিগত ও রাজনৈতিক দলাদলি দেখা দেয়। তাই গ্রামীন, নগর ও বিশেষ অঞ্চলের স্থানীয় সরকার সংস্থাসমূহ এবং বিভিন্ন স্তরগুলোকে বিছিন্নভাবে দেখার কোন অবকাশ নেই। স্থানীয় সরকার একটি সমন্বিত কাঠামো, সুষম বাজেট বরাদ্দ, প্রয়োজনীয় জনবল, দীর্ঘ কার্যতালিকার পরিবর্তে সুনির্দিষ্ট এবং সীমিত সংখ্যক কিন্তু কার্যকর কর্মকান্ড থাকা প্রয়োজন। সে জন্য প্রয়োজন স্থানীয় সরকার বিষয়ক একটি সর্বসম্মত জাতীয় নীতি। এ নীতির অধীনে বাজেট বিষয়ক একটি নির্দিষ্ট অংশ প্রতিবছরই স্থানীয় সরকারের জন্য বরাদ্দ থাকতে পারে। ঐ বরাদ্দ জনসংখ্যা অনুপাতে এবং উন্নয়নের প্রয়োজনের ভিত্তিতে গ্রামীন ও নগর স্থানীয় সরকারের মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট নীতির আওতায় বন্টিত হতে পারে। কিন্তু স্থানীয়

সরকার বিষয়ক একটি সুষ্ঠু সরকারী নীতির অভাবে এই প্রতিষ্ঠান সমূহের সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে যে কর্মতালিকার উল্লেখ রয়েছে তা খুব দীর্ঘ ও সম্পদের তুলনায় অপ্রতুল এবং স্বভাবতই অকার্যকর। হুদা কমিশন উল্লেখ করেছে যে, ইউনিয়ন পরিষদে সরকারি মঞ্জুরী অত্যন্ত অল্প। অথচ এর প্রশাসনিক খরচ অনেক বেশী।[২৮] ফলে এ সংস্থাকে সব সময়ই সরকারি অনুদানের উপরে নির্ভর হতে হয়েছে। জাতীয় সরকারের অনুদানের উপর নির্ভরশীলতার আর একটি কারণ হলো ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ জনপ্রিয়তা হারানোর ভয়ে রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে কোন কঠোর মনোভাব বা কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনীহা প্রকাশ করেন। ইউনিয়ন পরিষদের রাজস্ব আদায়ের সংকট অতিক্রম করার উদ্দেশ্যে রহমান আলী কমিশন আয়ের উৎস বৃদ্ধি করার পরামর্শ দেয়। কিন্তু রাজস্ব আয়ের ব্যাপারে পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন হয়নি।

স্থানীয় সরকারের আর একটি সমস্যা হলো- এর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য কোন জনবল নেই। সেদিক থেকে স্থানীয় সরকারের জন্য প্রয়োজন দক্ষ জনবল সৃষ্টি করা। বর্তমানে স্থানীয় সরকারের যে সম্পদ রয়েছে, সেই সম্পদ একটি পূর্ণাঙ্গ জনবল সৃষ্টির পক্ষে কোনভাবেই সহায়ক নয়। সে কারণেই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রেষণে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের উপর স্থানীয় সরকারকে নির্ভর করতে হচ্ছে। রহমত আলী কমিশন স্থায়ী ভিত্তিতে স্থানীয় সরকার কমিশন গঠনের সুপারিশ করেছে। এই কমিশন স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মকান্ড সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় জনবলের সংখ্যা পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোক নিয়োগের সুপারিশ করে। স্থানীয় সরকারের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য সকল পর্যায়ে একে সম্পর্কযুক্ত হতে হবে এবং এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে নিয়োগকৃত কর্মকর্তার জন্য পদোন্নতির ব্যবস্থা থাকতে হবে। যে পর্যায়ে কর্মকর্তাদের নিয়োগ সে পর্যায় থেকে কোন পদোন্নতি ছাড়াই যদি তারা অবসর গ্রহণ করেন, তবে তাদের মনে হতাশার প্রভাব পড়বে এবং তার নেতিবাচক প্রতিফলন ঘটবে তাদের কার্য সম্পাদনে। এটি এড়ানোর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্তরের স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানগুলোকে অঙ্গাঙ্গিভাবে একিভূত করে পদোন্নতি সিড়ির ব্যবস্থা করতে হবে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে স্থানীয় সরকার হচ্ছে গণতন্ত্র চর্চা ও জাতীয় নেতৃত্ব সৃষ্টির সূতিকাগৃহ। কিন্তু বিস্ময়কর হলেও সত্য যে, নিজস্ব ধরনের গণতন্ত্র আর ভারসাম্যপূর্ণ সরকারের কথা বিবেচনায় রেখে রাজনৈতিক দলগুলোর কোনটিই শক্তিশালী স্থানীয় সরকারের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেনি। অবশ্য ইতিমধ্যে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি কমিটি গঠন করেছে। উক্ত কমিটি বাংলাদেশে গনতন্ত্রের শিকড় শক্তিশালী করতে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উন্নয়নে কার্যকর ও অর্থপূর্ণ সংস্কারে ভূমিকা রাখবেন এটি এখন সময়ের দাবী।[২৯] ১ জুলাই ২০০৮ থেকে পার্বত্য ৩ টি জেলায় জেলা জজ আদালত চালু এবং অতি সম্প্রতি মোবাইল নেটওয়ার্ক চালু করা হয়েছে- বর্তমানে বাংলাদেশ যে গনতন্ত্রের দিকে নতুনভাবে যাত্রা শুরু করেছে উল্লেখিত পদক্ষেপ গুলি তারই আঙ্গিক বহন করছে।

উপসংহার

গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকার, জনগণের মধ্যে সমঝোতা বজায় রেখে পরস্পর মতামতের প্রতি সহিষ্ণু ও শ্রদ্ধাশীল হয়ে কাজ করতে শিক্ষা দেয়। জাতীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব বিকাশের প্রাথমিক পর্যায় স্থানীয় সরকার। প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের ভিত্তি রচিত হতে পারে যথার্থভাবে প্রাসঙ্গিক স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে। জন স্টুয়ার্ট মিল বলেছেন যে, সরকারি কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে জনকার্য সম্পাদন সম্পর্কে এক দিকে যেমন জ্ঞান অর্জন করা যায় অপর দিকে তেমনি দায়িত্বশীলতা ও স্থানীয় নেতৃত্ব অর্জন করা যায়। গণতন্ত্র চর্চা ও বিকাশে স্থানীয় সরকারের মূল্য ও গুরুত্ব অনেক বেশী। স্থানীয় সরকার গঠন প্রক্রিয়া জনগণকে সচেতন করে তোলে, তাদের ভোট প্রদানের জন্য সংঘবদ্ধ করে, জনগণের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে মেলামেশার এবং সমস্যা সম্পর্কে ঘনিষ্ঠভাবে জানার সুযোগ করে দেয়। জাতীয় সরকার অপেক্ষা স্থানীয় সরকারই নিবিড়ভাবে জনগণের সান্নিধ্যে আসে এবং সমস্যা সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করে। এক কথায় বলা যায় স্থানীয় সরকার দায়িত্বশীল নেতৃত্ব সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করে। লর্ড ব্রাইসের বিখ্যাত গ্রন্থ "*Modern Democracies*"- এ স্থানীয় সরকারকে গণতন্ত্রের চর্চা ও সফলতার শ্রেষ্ঠ প্রশিক্ষণাগার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রবসনও অনুরূপভাবে উল্লেখ করেছেন যে, "জাতীয় পর্যায়ে গণতন্ত্র সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারে যদি গণতন্ত্র, নির্বাচিত স্থানীয় সরকার কর্তৃক সমর্থিত এবং যথাযথভাবে প্রতিপালিত ও সংরক্ষিত হয়।"

রাজনীতির সঙ্গে সংস্কৃতির একটি ওতপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে বিশেষত রাজনৈতিক সংস্কৃতির যথার্থ মানসিক বিকাশের জন্যে আঞ্চলিক সংস্কৃতির অবরুদ্ধতাকে ভাঙ্গা একটি পূর্ব শর্ত। সেজন্যে একদিকে যেমন প্রয়োজন একটি সাধারণ শিক্ষানীতি ও একটি সাধারণ সংস্কৃতি নীতি তেমনি রাজনৈতিক দলের কর্মকান্ডকে মাটির কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া। বাংলাদেশের রাজধানীকেন্দ্রিক উত্তরাধিকার রাজনীতির প্রবঞ্চনা থেকে মুক্ত হয়ে আমাদের স্বাধীনতা বিষয়ক নীতি নির্ধারণ করা জরুরী। তার শুভ সূচনা ও পটভূমি হতে পারে স্থানীয় সরকার পদ্ধতি। এত করে নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত জনগণ গণ অধিকার ও দায়িত্ব কাঠামোর মধ্যে উপস্থিত হতে পারবে এবং সমস্ত উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য জোরালো দাবী এবং সেই প্রসঙ্গে নৈতিকতার দাবীও জোরালো হয়ে উঠবে অর্থাৎ আমাদের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় কল্যানের সর্বত্রই স্থানীয় সরকার পদ্ধতি রাষ্ট্রীয় প্রকৃতি নির্ধারণ করে। এছাড়াও, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি রাষ্ট্র কতটা গুরুত্ব পালন করবে তা নির্ভর করে জাতীয় সংহতির উপর। জাতিসত্তার সংহতির মাধ্যমেই এই সম্ভাবনা নিশ্চিত করা সম্ভব। আমাদের সমস্ত নীতি নিরূপনে কেন্দ্রীয় হয়ে আছে এই প্রশ্নটি। রাজনীতি স্বাধীনতার পূর্বশর্ত। রাজনীতি স্বাধীনতা নিরাপদ করে। জাতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্যক্তির আত্ম-অস্বীকার প্রবনতা তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ভূমিকাকে স্থবির ও অচল করে তোলে। এই অচলতায়নকে ভাঙ্গার জন্যই প্রয়োজন ঐ স্থবির ঐতিহ্য সর্বস্ব স্থানীয় সরকার পদ্ধতির উপরে উল্লেখিত পথে সংস্কার সাধন করা যা আজও পার্বত্য অঞ্চলে বিরাজ করছে।

পাদটীকা

১। আহমেদ, তোফায়েল -একুশ শতকের স্থানীয় সরকার এবং মাঠ প্রশাসন কতিপয় সংস্কার প্রস্তাব

২। Siddique Kamal, edited: Local Government in Bangladesh, 2nd edi. UPL, Dhaka 1995. P: 24

৩। Kabeer, Rokeya Rahman: Administration Policy of the Government of Bengal (1870-1890), Dhaka, NIPA, 1965, P:5

৪। Ibid, P:6

৫। The Village Choukidary Act, 1870.

৬। Gopal, S: The Vice-royalty of Lord Ripon 1880-84, London, Oxford University Press, 1953, P:106

৭। The Bengal Administration Report 1885-86, P: 70-71

৮। Bhuiyan, Shafiullah : The foundation of Rural Self govt. in Bengali: The Dacca University Studies , Vol-27, Part-A 1978. PP-45

৯। আহম্মদ, অধ্যাপক এমাজউদ্দীন: বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা-২০০০, পৃ: ৩৮৬।

১০। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৩৮৮।

১১। Presidential Order No. 7 of 1972. The Bangladesh Local Councils and Municipal Committee (Dissolution and Administration) Order1972.

১২। আহমেদ, তোফায়েল -একুশ শতকের স্থানীয় সরকার এবং মাঠ প্রশাসন, পৃ:১৫।

১৩। "পার্বত্য জেলায় আইন সংকলন" জেলা প্রশাসন খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

১৪। আহমেদ, তোফায়েল - বিকেন্দ্রীকরণ, মাঠ প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার একুশ শতকের জন প্রশাসন সংস্কার ভাবনা।

১৫। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ১৭।

১৬। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ১৭।

১৭। সিদ্ধার্থ চাকমা, প্রসঙ্গ পার্বত্য চট্টগ্রাম , নাথ ব্রাদার্স , কলকাতা , ১৩৯২, পৃ:১৮।

১৮। মুহিত আবুল মাল আব্দুল -জেলায় জেলায় সরকার ঃ স্থানীয় সরকার আইনসমূহের একটি পর্যালোচনা

১৯। খালেকুজ্জামান এ,আর,এম, -জেলা প্রশাসন বাংলাদেশ

২০। শামসুর রহমান মোহাম্মদ -লোক প্রশাসন তত্ত্ব ও বাংলাদেশ প্রশাসন,পৃ: ৭৪৯

২১। প্রাগুক্ত - পৃ: ৭৫১

২২। সিংহ রামকান্ত - বাংলাদেশের উপজাতিদের আইন পৃ: ২২৪

২৩। প্রাগুক্ত - পৃ: ২৫২

২৪। হোসাইন নাসিম আখতার - সমাজতত্ত্ব, সমকালীন বাংলাদেশ - সমাজ ও সংস্কৃতি, পৃ: ১৫৩-১৫৪

২৫। Syed Aziz Al Hasan and Bhumitra Chakma, "Problem of National Integration in Bangladesh", Asian Survey, vol.XXXIX, no 10, 1989.

২৬। সিদ্দীকী কামাল -বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার
২৭। Mallick, Bishawjit- Local Government: Local People's Institation
২৮। আজহার আলী কাজী - বাংলাদেশের জেলা প্রশাসন।
২৯। আমিনুজ্জামান, সালাউদ্দিন এম-স্থানীয় সরকার: সংস্কার ও পুনর্গঠনে বিবেচ্য বিষয়, প্রথম আলো, ৩০ জুলাই ২০০৭

Recent Books of Osder Publications

Author	Title	Price
M. Asaduzzaman	Institutional Analysis Of Rural Development	300.00
Mobasser Monem	The Politic of Privetisation in Bangladesh	300.00
A.A. Rehman,ph.D (MIT)	Human Rights Law for 21th Century	300.00
M. Abdul Wahhab	Decentralization in Bangladesh	250.00
A.A. Rehman,ph.D (MIT)	Inflation Prevention and Distributive Justice	
Md. Sharif Hossain	Income Inequality in Bangladesh	300.00
Saifuddin Ahmed	Ngo Perception of Poverty in Bangladesh	200.00
Ahamuduzzaman	International Human Righta law	200.00
Ahmad Anisur Rahman	Modernising Religion	250.00
Mohammad Azizuddin	Public Administration Reform Challenges and Prospects in Bangladesh	195.00
Taiabur Rahman	Bureaucratic Accountability in Bangladesh: The Role of Parliamentary Committees	400.00
Shamima Tasnim	Job Satisfaction in Teaching	200.00
A.A. Rehman,ph.D (MIT)	World Currency	
Mohammad Rafiqul Islam Talukdar	Rural Local Government In Bangladesh	
মোঃ ইয়াহইয়া আখতার	রাজনীতির চালচিত্র	250.00
অ্যাডঃ আজিজুর রহমান	থানায় আপনার অধিকার	80.00
কাওকাব সিদ্দিকি	মুসলিম নারীর সংগ্রাম	150.00
মাসুদা কামাল	বাংলাদেশের লোকপ্রশাসন	160.00
আহমদ আনিসুর রহমান	উন্নয়ন প্রশাসনের সাংস্কৃতিক পরাকাঠামো	175.00